নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড প্রথম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	স্তব	...		১
২।	অন্তর্যামী (কবিতা)	...		৪
৩।	নূতনে পুরাতনে	...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।	৫
৪।	মৃণালের কথা (গল্প)	...		২০
৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।	৫৭
৬।	হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব	...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।	৭১
৭।	পৌরাণিকী কথা	...	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।	৮৫
৮।	বৃন্দাবন (ভ্রমণ)	...	শ্রীজলধর সেন।	৯৭
৯।	আমার শিল্প	...	শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা।	১০৯

কার্য্যালয়—১৪৮ নং রসা রোড (সাউথ), কালীঘাট, কলিকাতা।

হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব

(শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল কথিত)

য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় সাধনা।

য়ুরোপ যত বড় হউক না কেন; তার বাহিরেও যে একটা আরও বড় জগত আছে, য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাই যে জগতের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনা নয়, অথবা চীনের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা যে বিশ্ব-মানবের শৈশব-লীলা মাত্র ছিল, তার পরিপূর্ণ যৌবন-লীলা প্রথম য়ুরোপেই হইতেছে, এ সকল কথার ভ্রান্তি ক্রমে ধরা পড়িয়াছে। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, সমষ্টিগত মানব সমাজের সভ্যতা ও সাধনা একটা সরল রেখার ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জীব-জগতের ক্রমবিকাশের বা ইভোলিউশনের ধারাকে ফরাসী পণ্ডিত লা মার্ক এই ভাবেই কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সে ভুল খণ্ডন করিলেও, আজিকালিকার সমাজ-বিজ্ঞান মানব সমাজের ক্রমবিকাশে সেই লামার্ক-কল্পিত ক্রমই দেখিতেছে। চীন একদিন কতকটা পরিমাণে একটা বিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতা ও সাধনা গড়িয়া তুলিয়া ছিল; তারপর চীনের বিকাশক্রম চিরদিনের মতন থামিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালে একটা অত্যদ্ভুত সভ্যতার ও সাধনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; কিন্তু সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে; তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই। মানবপ্রকৃতির ও মানবের সভ্যতার এবং সাধনার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ দেখিতে হইলে, এখন য়ুরোপের গ্রীক্-রোমক্ গথিক্-হিব্রু-খৃষ্টীয় সভ্যতা ও সাধনারই আলোচনা করিতে হইবে। য়ুরোপের

জনসাধারণের ত কথাই নাই, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যেও চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এই ধারণা প্রবল রহিয়াছে। এই ভ্রান্তিটা দূর করিবার জন্য ভারতের সভ্যতা ও সাধনা বিশ্বমানবের উন্নতি কল্পে কতটা কি করিয়াছে বা না করিয়াছে, তার আলোচনা ও প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশীয়েরাই যে কেবল এ সকল তত্ত্বের সন্ধান রাখেন না, তাহা নহে। আমরাও ভাল করিয়া এ সকল কথা জানি না। আমাদের স্বদেশাভিমান, এবং এই স্বদেশাভিমান হইতে যে স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বত্রই জাগিয়া উঠে, সেই পক্ষপাতিত্বের বা পেট্রিয়টিক বায়সের (patriotic bias'এর) প্রভাবে আমরা আমাদের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনাকে জগতের অপর সকল সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে। য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া, য়ুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এ বিষয়ে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয়েই স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। উভয়ের বিচারই সেই জন্য সত্য-ভ্রষ্ট। উভয়েই সভ্যাভাস মাত্রকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সত্যকে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন।

বিশ্বমানব।

সত্য কথা কিন্তু এইযে বিশ্বমানব বিশ্বব্যাপী। ছোট বড়, পুরাতন ও অধুনাতন, য়ুরোপ আসিয়া আফ্রিকা ও মার্কিণ, সকল

জ্ঞাত মহাদেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বিশ্ব-মানবের অথবা নর-নারায়ণের লীলাভূমি হইয়া আছে। সে লীলা বিশ্বব্যাপী লীলা। এই লীলাময় বিশ্বমানব এক অখণ্ড বস্তু বা তত্ত্ব। সকল মানবে ও সকল মানব সমাজেই ইনি একই সঙ্গে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অব্যক্তরূপে তিনি কোথাও পরিপূর্ণ নহেন। কোনও সমাজ, কোনও সভ্যতা, কোনও সাধনা, এই বিশ্বমানবের বা Universal Humanity'র আত্মবিকাশধারার একটী বা দুইটী বা তিনটী তরঙ্গ-ভঙ্গ (moments) প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। আর অপর কোনও সমাজ, সাধনা ও সভ্যতা বা তার আর দুই তিনটী তরঙ্গ-ভঙ্গ বক্ষে ফুটাইয়া অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। ভারতবর্ষও বিশ্ব-মানবের অঙ্গ, বিশ্ব-মানবের লীলাক্ষেত্র, বিশ্ব-মানবের লীলার সহায় ও সহচর। য়ুরোপও তাহাই। য়ুরোপ তাঁর এই বিশ্ব-ব্যাপী লীলা-নাট্যের দু'একটী অঙ্কের অভিনয় করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতবর্ষ অপর দু'একটী অঙ্ককে আপনার ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রকট করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতের ও য়ুরোপের সত্যের এবং সাধনার আলোচনা করিবার সময় সর্ব্বদা এই কথাটী স্মরণ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

সামান্য-মনুষ্যধর্ম্ম।

মানুষ মাত্রেরই কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে। এই গুণ-সামান্যই মনুষ্যত্বের সার্ব্বজনীন নিদর্শন। সকল মানুষেরই চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ও নিয়ন্তারূপে সকলেরই কতকগুলি সাধারণ মনোবৃত্তি আছে। আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় একটা রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শময় বহির্জগৎও সকলের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। চিরদিনই মানুষ এই সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বহির্জগতে বিচরণ করিয়া আপনার জীবনের অশেষবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। এই সকল অভিজ্ঞতার প্রকৃত ও নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে যাইয়াই মানুষ

সর্ব্বত্র আপনার দর্শন ও বিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয় সকল মোটের উপরে এক এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই রূপরসাদিপূর্ণ বহির্জগৎও স্বল্পবিস্তর সমানধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এই সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা এবং সাধনা বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছে। একই সময়ের ও একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকেও একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম বাহির করিয়া লয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন সাধনাও সেইরূপ মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিচার ও আলোচনা করিয়া, জীব ও জগৎ, জীব ও জগতের পরস্পরের সম্বন্ধ, জীবের জন্ম ও মৃত্যু, জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি ও পরিণতি, এ সকল সম্বন্ধে কতকগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল সিদ্ধান্তকেই দর্শন কহে। এই সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষ আপনার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি ও জ্ঞান-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু একদিকে যেমন মানুষের একটা অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা আছে, অন্যদিকে সেইরূপ তার অনন্ত রসপিপাসা এবং কর্ম্ম-লিপ্সাও রহিয়াছে। কেবল জ্ঞানেতেই মানুষের তৃপ্তি হয় না। যাহাকে সে জ্ঞানেতে লাভ করিল, তাহাকে সে ভোগ করিতে চাহে, তার মধ্যে সে আনন্দ অন্বেষণ করে, তার সঙ্গে সে রসের সম্বন্ধ পাতাইতে যায়, তাহার দ্বারা তার ভাবেরও তৃপ্তি করিবার জন্য সে লালায়িত হয়। ফলতঃ, জ্ঞান ও ভাব দুইটা বস্তু নহে; একই অভিজ্ঞতার দুই দিক মাত্র। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই রস বা ভাব জাগে। ভাব জাগিলেই তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও সম্যক্ সার্থকতার জন্য সেই জ্ঞান ও ভাব উভয়ে মিলিয়া কর্ম্মের প্রেরণাকে জাগাইয়া দেয়। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম—Reason, Emotions, Will—এই তিন পাদে মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই পূর্ণ হয়।

জ্ঞানের পূর্ণতা অপূর্ণতা, ভাবের পরিপক্কতা বা অপরিপক্কতা, কর্ম্মের পটুতা বা অপটুতা,—এ সকল বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ থাকে বটে। কিন্তু যেখানে জ্ঞান সেখানেই ভাব, যেইখানেই ভাব সেইখানেই কর্ম্ম-চেষ্টা,—অনায়ত্তকে আয়ত্ত, যাহা লোভনীয় অথচ আপাততঃ অলব্ধ, তাহাকে লাভ করিবার জন্য বহুবিধ উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোজন,—এসকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ম্মই সাধন। যে পরম-তত্ত্ব ঐ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও ভাবের আশ্রয় তাহাই এই সাধনের নিত্য সাধ্য বস্তু।

মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষের প্রভাব।

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সভ্যতা ও সাধনা মানবীয় অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছে, মানব জীবনের কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, মানবসমাজের গঠন ও বিকাশের কতকগুলি বিশেষ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে এবং মানব জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট সাধন অবলম্বন করিয়াছে। এইগুলি ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার বিশিষ্ট ও নিজস্ব বস্তু। এইগুলিই বিশ্বমানবের বিকাশে ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট কর্ম্ম। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত, মধ্য-আশিয়ার বিস্তৃত উপত্যকাভূমি হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র প্রাচ্য ও মধ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতের এই সাধনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসরকাল এই বিশাল মানব সমাজ যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন, যে সমাজ-নীতির অনুসরণ, জীবনে যে আদর্শের সাধন করিয়াছে, তার গভীরতম মর্ম্ম এবং মূল সূত্রগুলি ভারতের তত্ত্ববিদ্যার, ভারতের সমাজনীতির এবং ভারতের ধর্ম্ম-নীতির ও ধর্ম্ম-সাধনের মধ্যেই কেবল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী রোমক-শাসন-যন্ত্র, রোমক-রাষ্ট্র-তন্ত্র, এবং রোমক-ব্যবহার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইয়া পৃথিবীতে একটা

নূতন একতার ও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কোনও দিন আশিয়াখণ্ডে এরূপ কোন পার্থিব সাম্রাজ্যের বা শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা করে নাই, বা করিতে চাহে নাই। কিন্তু রোম যেমন য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার রাষ্ট্র-তন্ত্র, ব্যবহার-বিধি, এবং শাসন-যন্ত্রের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইরূপে ভারতবর্ষও সমগ্র মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির এবং পারমার্থিক সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছে। পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তি বা পার্থিব সম্পদ ও সাধনার প্রভাব অপেক্ষা যে পরিমাণে গভীরতর হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার উপরে রোমের প্রভাব অপেক্ষা প্রাচ্য আশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার উপরে ভারতবর্ষের প্রভাবও সমধিক গভীর ও স্থায়ী হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে আশিয়ার এই বহুবিস্তৃত ভূভাগে, এই অগণ্য কোটি লোকপুঞ্জের মধ্যে, জাতি-বর্ণ-গত, আচার-অনুষ্ঠান-গত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-গত, অশেষ প্রকারের বৈষম্য ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এসকল ভেদবিরোধের মধ্য দিয়াই আমরা একটা বিশিষ্ট আকারের সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি আদর্শ এবং সাধন-পন্থাও দেখিতে পাই। আর ভারতের তত্ত্ব-জ্ঞানই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সমাজ-তন্ত্র, জীবনাদর্শ, ও ধর্ম্ম-কর্ম্মকে আত্মজ্ঞানের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া তার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সভ্যতা ও সাধনাকে আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের যন্ত্র ও সাধনরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষ যে কেবল প্রাচ্য আশিয়ার সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও আধ্যাত্মজীবনকেই আপনার তত্ত্বজ্ঞান ও সাধন-পন্থার দ্বারা পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহা নহে। যে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে আশিয়া সত্যের সন্ধানে গিয়াছে, তার মূল উপাদন ও প্রণালী, তার বৈজ্ঞানিক অনুভূতি বা scientific concepts,

যে ভাবে আশিয়া এই প্রত্যক্ষ জগৎকে জানিতে ও ধরিতে গিয়াছে তার শ্রেণীবিভাগ, আর মানুষের সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের যে সকল সূত্র ও সন্ধান ধরিয়া আশিয়া সত্তার বা সত্যংএর এবং চৈতন্যের বা জ্ঞানংএর মূল প্রকৃতির অনুসন্ধানে যাইয়া আপনার বিবিধ তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তৎসমুদায়ই ভারতের নিকট হইতে পাইয়াছে। জাপানের ও চীনের তর্কশাস্ত্র ভারতের ন্যায়ের মূল সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। য়ুরোপের ন্যায়দর্শন গ্রীশীয় ন্যায়ের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রীশীয়দিগের প্রমাণপ্রতিষ্ঠার প্রণালী ভারতের প্রমাণবিজ্ঞানের প্রণালী হইতে ভিন্ন। জাপানের ও চীনের প্রমাণবিজ্ঞানে ভারতীয় ন্যায়েরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীশীয় ন্যায়ের নহে। ভারতবর্ষের প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা phioslophy of nature জড় ও গতির, কারণ ও কার্য্যের, দেশ ও কালের যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, চীনের মধ্যযুগের বিজ্ঞান তাহারই উপরে গড়িয়া উঠে। হিন্দুর রাসায়ণজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই চীনে কোনও কোনও পণ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। চীন নানা প্রকারের রঙ্গের আবিষ্কার করিয়াছে, আর তার কতকগুলি হিন্দুর রসায়ণবিদ্যার আশ্রয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এমন কি বিশেষজ্ঞেরা মধ্যযুগের চীনের এবং জাপানের ললিতকলাতেও ভারতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

দর্শনের উপাদান।

ইহজীবনে আপনার শরীর মনের আশ্রয়ে মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে তার নিগূঢ় মর্ম্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিতে যাইয়াই দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। অভিজ্ঞতা বলিতে এক জন জ্ঞাতা, এই জ্ঞাতার কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় এবং এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কতকগুলি শারীরিক যন্ত্র ও মানসিক বৃত্তির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষই

জ্ঞাতা এবং প্রত্যেকেরই জ্ঞানলাভের জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও কতকগুলি মনোবৃত্তি আছে। এই জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয় মোটের উপরে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম, সে তার নিজকে জানে, আপনাকে জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা রূপে জানে, অতএব সে নিজে তার নিজের জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়। ২য়, সে এই বিশাল বিষয়-রাজ্যকে জানে, এই বহির্জগতের রূপরসাদি তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া তার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ৩য়, সে অপর মানুষকে এবং এই মানুষ যে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে তাহাকেও জানে। ঐ বহির্জগৎ বা বিষয় রাজ্য (আর এখানে আমাদের শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং মনোবৃত্তি সকল পর্য্যন্ত বিষয়পদবাচ্য হয়) এবং অপর মানুষ ও মনুষ্য-সমাজ—এই উভয়ই আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষায় ইদং পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই ইদংকে যে জানে, যে ইদংএর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া, যাহাকে এই ইদংএর সম্পর্কে কর্ত্তাও বলা যায়—সেই মানুষ অহং পদবাচ্য হয়। এই অহং ও এই ইদংকে লইয়া মানুষের যা কিছু লীলাখেলা। এই দুই তত্ত্বের আশ্রয়েই মানুষ তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতার উৎপত্তি কোথায়, স্থিতি কিসে, গতি কোন্ দিকে, নিয়তি কি, ইহার প্রকৃতি ও প্রণালী, মূল্য ও মর্ম্ম কি, এসকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়াই যাবতীয় দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতের সাধনা এই মানবীয় অভিজ্ঞতার কি বিশেষ তত্ত্ব ও মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে? আমাদের দেশে এই বিশ্ব সমস্যার কিরূপ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে,—সকলের আগে আমি এই প্রশ্নেরই আলোচনা করিব। তারপরে হিন্দু এই বিশাল বিষয় রাজ্যকে কোন্ চক্ষে দেখিয়াছে, মানুষ এবং মানবসমাজ সম্বন্ধেই বা হিন্দু কোন্ বিশেষ সিদ্ধান্তের, তত্ত্বের ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছে, ক্রমে এসকল বিষয়েরও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমে এই শান্তিবাচন আছে,—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"ওঁ তাহা (অর্থাৎ বিশ্বের অব্যক্ত বীজ) পূর্ণবস্তু। ইহা (অর্থাৎ ঐ বীজের ব্যক্ত আকার) পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয় তখন পূর্ণই কেবল অবশিষ্ট থাকে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

হিন্দুরা কি ভাবে আপনার যাবতীয় অভিজ্ঞতার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এই শান্তিবাচনে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে এই হেঁয়ালির ব্যাখ্যা দেখিতে পাই।

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত মাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদং রূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নোহি স প্রাণস্যৈব প্রাণেনাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানোমনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদ অকৃৎস্নোহ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি আত্মেত্যেবোপাসীতাত্রহেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ। যথাহবৈপদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবংবেদ।"

"তখন সেই অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ব্রহ্মই কেবল ছিলেন। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুই নামরূপের দ্বারা ব্যক্ত হইলেন। এই জন্য এখনও লোকে নাম ও রূপের দ্বারাই সমুদায় পদার্থকে বিশিষ্ট করিয়া থাকে—বলে "ইহার এই নাম", "উহার এই আকার"।

"সেই ব্রহ্ম এই ব্যক্ত ও নামরূপের দ্বারা বিশিষ্টকৃত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট

হইলেন। নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষুর যেমন আপনার আধানে নিঃশেষে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ হইলেন। অথবা সকল বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে যে বায়ুমণ্ডল, তাহা যেমন আপনার মণ্ডলস্থিত সকল জীবের অন্তর্দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেই ব্রহ্ম সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

"কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সকলের অন্তরতর ও অন্তরতম বস্তু, তথাপি অল্পবুদ্ধি লোকে তাঁহাকে দেখে না। তাঁহাদের নিকট তিনি অকৃৎস্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন। তাঁর অনুপ্রাণনেই জীবের প্রাণন ক্রিয়া সম্ভব হয়। এই জন্য ইহারা তাঁহাকে প্রাণ নামে অভিহিত করে। তাঁহারই প্রেরণায় জীবের বাণী উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা তাঁহাকে বাক্ বলে। সেইরূপ শ্রবণ জন্য তাঁহাকে শ্রোত্র, দর্শন জন্য তাঁহাকে চক্ষু, মনন জন্য তাঁহাকে মন বলে। কিন্তু এ সকল তাঁর কর্ম্মেরই নাম মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্রাদির নাম ও কর্ম্মের মধ্যে তিনি অখণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব যাহারা তাঁহাকে প্রাণাদিরূপে ভজনা করে, তাহারা সমগ্র তত্ত্বের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের এই অপূর্ণজ্ঞাননিবন্ধন তারা সচ্চিদানন্দ পুরুষের সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ অজ্ঞ থাকিয়া যায়।

"এই আত্মাতেই তাঁর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা বিরাজিত; জ্ঞান, আনন্দ, প্রাণ, সকলই এই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাতেই এ সকল বহুবিধ নামরূপ এক হইয়া আছে। "ঐ" আর "এই" সকলই আত্মা। "তাহা" ও "ইহা" সকলই আত্মা। যাঁহাকে আত্মা কহে এ সকল তাঁহারই বিবিধ জ্ঞানবলক্রিয়া। আত্মাই এ সকলের বীজ ও আশ্রয়। এই আত্মার উপাসনার দ্বারাই সকল জ্ঞান লাভ হয়। যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে আপনার ঈপ্সিত লাভ করে, সেইরূপ এই আত্মাকে যে জ্ঞাত হয় সে কীর্ত্তি এবং পরমানন্দ ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

"এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রথম মন্ত্রে "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল আত্মা মাত্র ছিলেন, তিনি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন আর কেহ ও কিছু নাই, তখন তিনি "অহং" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন—

এই সকল বলিয়া এবং এই পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য, অপর দেবতা উপাস্য নহেন, এই উপদেশ করিয়া, শ্রুতি এখন, এই পঞ্চম ব্রাহ্মণে, এই আত্মা হইতে কিরূপে এই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অনন্ত এবং তিনি নিত্যই পরিপূর্ণ। এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী পরিপূর্ণ ঈশ্বর আংশিক বা অপূর্ণ ভাবে কোনও বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন না। এইরূপ কল্পনা তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বেরই বিরোধী। তিনি যেখানেই থাকুন, পরিপূর্ণ রূপেই থাকেন। অতএব অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাতে তিনি পরিপূর্ণ রূপেই বিরাজ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে ঈশ্বর রূপে ভজনা করা সঙ্গত নহে। এই জন্যই শ্রুতি কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পরম পুরুষকে অগ্নি কিম্বা বায়ুরূপে ভজনা করে, তার উপাসনা অপূর্ণ হয়; কারণ এ সকল তাঁর ক্রিয়া বিশেষের বা গুণবিশেষের প্রকাশ মাত্র, তাঁর সর্ব্বগুণ প্রকাশ করে না।

পরমপুরুষ পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে উপাসিত হন, তখনই কেবল তাঁর পূর্ণ উপাসনা হয়। এই আত্মা বা "অহং"ই জ্ঞানের ও চৈতন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই জন্যই পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে বা "অহং" রূপে উপাসিত হন, তখনই তাঁর সত্য উপাসনা হইয়া থাকে। অপিচ, এই আত্মা বা অহং শব্দ পূর্ণতা জ্ঞাপক। জীব শরীরের আর কোনও চেষ্টা এই অহং প্রত্যয়ের পূর্ণতার সমকক্ষ হইতে পারে না। প্রাণন, শ্রবণ, দর্শনাদি মানুষের ক্রিয়া বিশেষের বিভিন্ন অংশ মাত্র প্রকাশ করে। কিন্তু যখন সে অহং বলে, তখন তার মধ্যে এই সমুদয়ের প্রাণনাদি ক্রিয়া এবং তার অতিরিক্ত আরও অনেক তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকে। অতএব পরমপুরুষের মধ্যে আমরা যে সকল গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ও পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করি, এই অহং নামে বা শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে অধিক ব্যক্ত করিয়া থাকে।"

উপরে মূল শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার মাধ্বভাষ্যের মর্ম্ম বাঙ্গলা করিয়া দিলাম। আমার বর্ত্তমান প্রয়োজনের জন্য ইহাই যথেষ্ট। এই প্রাচীন ঋষিবাক্যে আমরা তিনটী বিশেষ তথ্য প্রাপ্ত হই;—

১ম,—একটা পূর্ণতত্ত্বের অনুভূতি, আর আত্মাই এই পূর্ণতত্ত্ব। ২য়,—আমরা যাহাকে "আমি" "আমি" বলি সেই অস্মদ প্রত্যয়ের বস্তুই আত্মবস্তু, আর এই আত্মবস্তুই বিশ্বের পরমতত্ত্ব ও পূর্ণ তত্ত্ব। ৩য়,—এই আত্মার অন্বেষণ ও আত্মাকে জ্ঞানেতে প্রাপ্ত হওয়াই পরমানন্দ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণতত্ত্ব।

যাহাতে এই বিশ্ব সমস্যার নির্ব্বিরোধ মীমাংসা হয়, তাহাকেই আমাদের দর্শনের পরিভাষায় তত্ত্ব কহে। এই ঋষি বাক্যেতে আমরা এই পূর্ণতত্ত্বের বা পরমতত্ত্বের একটা গভীর অনুভূতির প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এই বিশ্বের বস্তু বা বিষয় অশেষ; চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও এক নহে। ইহারা প্রত্যেকেই জাগতিক বস্তু সকলের এক একটী গুণ বা ধর্ম্মকে আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিয়া থাকে। চক্ষু বস্তুর রূপ, কর্ণ শব্দ, নাসিকা গন্ধ, এইরূপে প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের নিকটে উপস্থিত করে। এখানে একত্বানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়? বৃহদারণ্যক শ্রুতি কহিতেছেন, আপাততঃ যাহা বহুরূপে প্রতীত হইতেছে, মূলে তাহা বহু নহে। যাহা খণ্ড খণ্ড বলিয়া দেখা যাইতেছে, মূলে তাহা অখণ্ড। যাহা অপূর্ণ বোধ হইতেছে তাহা পূর্ণ। ব্রহ্মই সেই এক, সেই অখণ্ড, সেই পূর্ণ বস্তু বা পূর্ণ তত্ত্ব। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সেই পূর্ণবস্তুরই বিবিধ ও বহুমুখী প্রকাশ মাত্র। এই জন্য ইহারা ব্রহ্মেরই নিদর্শন। সেই ব্রহ্মকে, সেই পূর্ণতত্ত্বকেই ইহারা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করে, কেবল মাত্র আংশিক বা খণ্ডবস্তুকে প্রকাশ করে না।

আত্মাই পূর্ণতত্ত্ব।

বাহিরের বিবিধ বিষয় ও জীবের এই সকল ইন্দ্রিয় যে ব্রহ্মের আংশিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি মাত্র প্রকাশ করে, আত্মাই সেই ব্রহ্মের অখণ্ড

পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই আত্মার দ্বারাই "সূত্রে মণিগণা ইব"—হারের মণি সকল যেমন তার সূত্রেতে গাঁথা থাকে, সেইরূপ আমাদের দর্শনশ্রবনাদি নানাবিধ খণ্ডজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া জ্ঞানের বা অনুভূতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখি, কর্ণের দ্বারা গন্ধ শুঁকি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শলাভ করি; এ সকলই খণ্ডজ্ঞান। রূপ ও শব্দ, শব্দ ও স্পর্শ, স্পর্শ ও গন্ধ, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিভিন্ন অনুভূতির বিষয়; আর এই সকল বিভিন্ন অনুভূতি কখনও একই কালেও জন্মিতে পারে না। প্রবল স্রোতবাহী জলপ্রবাহের, কিম্বা প্রবল ঝাতামুখে বায়ুপ্রবাহের ন্যায় এ সকল অনুভূতি বিদ্যুৎবেগে ইন্দ্রিয়ের ও মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। চক্ষু রূপই দেখে, কিন্তু এই রূপও অখণ্ড বস্তু নহে। রামের রূপ প্রথমে তার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাহারে গঠিত; তার এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে যে বর্ণের আভা ফুটিয়াছে, তাহা বিন্দু বিন্দু বর্ণের সম্মিলনে রচিত। রূপ বস্তুও অখণ্ড নহে। চক্ষু কোন রূপই একেবারে ও একই সঙ্গে সমগ্রভাবে দেখিতে পায় না। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চক্ষু দেখে, কিন্তু এই খণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া আত্মা বস্তুর রূপের জ্ঞান ফুটাইয়া তুলে। শব্দজ্ঞানও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সংযোগে ও সমাহারে উৎপন্ন হয়। আর আত্মাই এই বিভিন্ন ধ্বনির সংযোক্তা। এই আত্মাই আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতার একত্বের ভূমি ও একীকরণের মূল সূত্র। এই আত্মাই আমাদের সকল অভিজ্ঞতার নিত্য সাক্ষী হইয়া এ সকলকে সম্ভব ও সার্থক করিতেছেন।

এই আত্মার অন্বেষণ, এই আত্ম-জিজ্ঞাসা ও যে আত্মজ্ঞানেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞানই একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দ বস্তু। ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মাকে জানিলে আর অপর কোনও কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। হিন্দুর দর্শন চিরদিনই এই একত্বের অন্বেষণ করিয়াছে। এই

একত্বানুভূতিই হিন্দুর অন্তঃপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই সহজ বুদ্ধি প্রভাবে হিন্দু সর্ব্বদা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বিরোধের মধ্যে মিলন ও সন্ধি, বহুর মধ্যে এক, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। এই জন্যই বিশাল বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া হিন্দুর তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্বপিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর অনুরাগের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। এই প্রেরণাতেই হিন্দু বলিয়াছে—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" অর্থাৎ যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই। আর এই ভূমাকে হিন্দু কেবল জ্ঞানের অজ্ঞেয় ভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। এই ভূমাই সমুদায় জ্ঞানের ও সমুদায় সত্তার আধার ও সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছেন। ইনি কেবল আছেন, এই সাধারণ অস্তিত্ব মাত্র অনুভব করিয়াই হিন্দু ক্ষান্ত হয় নাই। সকল দেশের সকল তত্ত্ববিদ্যা এবং তত্ত্বমীমাংসাই কোন না কোনও আকারে এই অনন্তকে বা ভূমাকে মানিয়া লইয়াছে। হিন্দু কেবল অনন্তকে এই ভাবে মানিয়া লইয়া স্থির থাকিতে পারে নাই, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বহুবিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছে, এবং অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই ভূমাকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' রূপে আপনার আত্মার মধ্যে এই আত্মার নিত্য সিদ্ধ একত্বের মূলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই নিগূঢ় একত্বানুভূতিই হিন্দুর নিকটে সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তকে, বাস্তবের মধ্যে আদর্শকে, বুদ্ধির মধ্যেই যাহা বোদ্ধব্য, জ্ঞানের মধ্যেই যাহা নিত্য জ্ঞাতব্য, তাহাকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুর অস্থি-মজ্জা-গত এই সহজ প্রকৃতিসিদ্ধ একত্বানুভূতিই তাহার সমুদায় জ্ঞানান্বেষণ ও কর্ম্মচেষ্টার প্রেরয়িতা হইয়া হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজীতে এক কথায় হিন্দুর বিশেষত্বের বা হিন্দুত্বের মূল সূত্রটি ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে,—

"The Hindu not only starts from Experience as a homogenous whole, but always in investigating the manyfold in the real world, returns to the actual synthetic unity in the *Atma*."

বারান্তরে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।